# এলসিডি এলইডি ডিসপ্লে কেনার আগে জেনে নিন

মোঃ তৌহিদুল ইসলাম

কমপিউটারের ভিজ্যুয়াল আউটপুট বলতে প্রথমেই আসে মনিটরের কথা। একটি নতুন কমপিউটার কেনার আগে অনেকেই জেনেশুনে ভালোমানের প্রসেসর, র‍্যাম, মাদারবোর্ড, হার্ডডিস্কের কনফিগারেশন করেন। উদ্দেশ্য থাকে ভালো একটি পিসি তৈরি করা। বাজারে গিয়ে কনফিগারেশন করা যন্ত্রাংশগুলোও খুঁজে খুঁজে কিনে আনেন। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই অনেক ক্রেতামনিটরের বিষয়টি মাথায় রাখেন না। অনেকে আবার বলেন, এক কোম্পানির একটি ব্যবহার করলেই হবে। ফলে দেখা যায় জেনে-শুনে-বুঝে মনিটর না কেনার জন্য যে মনিটরটি অনায়াসে দশ বছর ব্যবহার করা যেত তা পাঁচ বছরও টেকে না। আবার আগে থেকেই অন্যান্য যন্ত্রাংশের মতো মনিটরের নির্দিষ্ট মডেল ঠিক করতে না পারায় বিক্রেতাযেকোনো ব্র্যান্ডের একটি দিয়ে দেন। ফলে মনিটরটির কি কি সুযোগ সুবিধা রয়েছে তা সঠিকভাবে জানতে পারেন না। কিছুদিন পার হলেই ব্যবহারকারী বুঝতে থাকেন যে মনিটরটি অনেক কিছু সাপোর্ট করে না। ফলে মনিটরটি থেকে অনেক বাড়তি সুবিধাও পাওয়া যায় না। এমনও হয়, মনিটরের ওয়ারেন্টি সময়টুকু শেষ হলেই মনিটর অচল/নষ্ট হতে শুরু করে। আর সমস্যা দেখা দিলে অনেক ব্যবহারকারী মনিটরটি অনেক কম দামে বিক্রি করে নতুন আরেকটি মনিটর কেনেন। অনেকের ক্ষেত্রে এমন হয় মনিটর কেনার পর থেকে আস্তে আস্তে বুঝতে শুরু করেন তার চাহিদাগুলো। যখন ব্যবহারকারী বোঝেন তার প্রত্যাশিত চাহিদাগুলো তিনি মনিটর থেকে পাচ্ছেন না তখন তা বিক্রি করে নতুন আরেকটি মনিটর কেনেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়–আপনি টিভি কার্ড ছাড়াই একটি মনিটর কিনে নিয়ে আসলেন। পরে যদি মনিটরে টিভি দেখার ইচ্ছা হয়, তবে আপনাকে একটি এক্সটারনাল/ইন্টারনাল টিভি কার্ড কিনে মনিটর/পিসিতে সংযুক্ত করে তবে টিভি দেখতে হবে। কিন্তু মনিটর কেনার আগেই যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে টিভি মনিটর কিনতেন তবে নতুন করে টিভি কার্ড কেনা লাগত না এবং বাড়তি ঝামেলা পোহাতে হতো না। দেখা যায় বিশেষ করে তরুণরা মনিটর কেনার পরে প্রয়োজন অথবা চাহিদার কারণে প্রায় অর্ধ-নতুন মনিটর অনেক কম দামে বিক্রি করে দিয়ে নতুন আরেকটি মনিটর কেনেন।

যাই হোক ব্যবহারের ধরন অনুযায়ী বর্তমান সময়ের মনিটরগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

০১. ১৯ থেকে ২২ ইঞ্চি : শুধু অফিসিয়াল কাজকর্ম (যেমন–টাইপ, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, ডকুমেন্ট প্রিন্টিং) করা হবে।

০২. ২২ থেকে ২৬ ইঞ্চি : সাধারণত পার্সোনাল কমপিউটার ব্যবহারকারীরা এ সাইজের মনিটরের ক্রেতা।

০৩ ২৪ থেকে ৩০ ইঞ্চি : যারা বেশি গ্রাফিক্সের কাজ করেন, মুভি দেখেন কিংবা গেম খেলেন তারা এ সাইজের মনিটর পছন্দ করেন।

০৪. ২৬ থেকে ৩২ ইঞ্চি : মূলত যেসব কোম্পানি ফটোগ্রাফি, বড় কোনো ছবি প্রিন্ট, বড় বড় গেম তৈরি, মানচিত্র উন্নয়ন কাজ করেন তারা এ সাইজের মনিটর ব্যবহার করেন।

এ থেকে সহজেই বুঝতে পারবেন আপনি কি কাজের উদ্দেশ্যে মনিটর কিনবেন এবং আপনার জন্য কোন সাইজের ডিসপ্লে ভালো হবে।

এবার আলোচনা করা যাক মনিটরের কিছু প্রযুক্তি নিয়ে। যেকোনো মনিটর ক্রেতাই সহজেই একটি মনিটরের স্পেসিফিকেশন থেকে বুঝতে পারেন মনিটরটি কতটুকু টেকসই হবে।

কিছুদিন আগেও সিআরটি (ক্যাথোড রে টিউব) মনিটরের বেশ প্রচলন ছিল। বর্তমানে সে জায়গা দখল করেছে এলসিডি (লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে) এবং এলইডি (লাইট এমিটিং ডায়োড) প্রযুক্তি সংবলিত ডিসপ্লে। মূলত বেশ কিছু মারাত্মক সমস্যার জন্যই সিআরটি প্রযুক্তির মৃত্যু ঘটেছে। সিআরটির প্রধান তিনটি সমস্যা হলো–০১. বিদ্যুৎ খরচ অনেক বেশি। ০২. ডিসপ্লের রেডিয়েশন ছিল বেশি। ০৩. অ্যাঙ্গেল অব ভিউ (কৌণিক দূরত্ব থেকে দেখা) নেই।

অন্যদিকে সিআরটির তুলনায় এলসিডি এবং এলইডিতে যে সুবিধাগুলো পাওয়া যায় : ০১. সিআরটি থেকে অনেক বেশি বিদ্যুৎসাশ্রয়ী। ০২. এর ডিসপ্লের রেডিয়েশন সিআরটির তুলনায় অনেক কম। ০৩. তুলনামূলক সিআরটি থেকে জায়গা অনেক কম দরকার হয়। ০৪. এলইডি এলসিডির অ্যাঙ্গেল অব ভিউ আছে। ফলে অনেক বেশি কৌণিক দূরত্ব থেকে দেখা যায়। ০৫. ওজন কম তাই সহজে স্থানান্ত রযোগ্য। ০৬. ব্রাইটনেস বা ছবির ঔজ্জ্বল্য সিআরটির তুলনায় অনেক বেশি। তাই ছবির কোয়ালিটি অত্যন্ত চমৎকার। ০৭. সিআরটিতে ছবিতে ফ্লিকার দেখালেও এলসিডি এবং এলইডিতে ছবিতে ফ্লিকার দেখায় না।

বর্তমানে এলসিডির ডিসপ্লে তৈরিতে প্রধানত তিনটি প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে : ০১. টুইস্টেড নিউমেরিক (টিএন), ০২. ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট (ভিএ), ০৩. ইন প্লেন সুইচিং (আইপিএস)। যদিও স্যামসাং ২০১১ সালে এলসিডিতে নতুন একটি প্রযুক্তি যুক্ত করেছে–প্লেন টু লাইন সুইচিং (পিএলএস)। এ প্রযুক্তি ব্যবহৃত একটি মডেল হচ্ছে Samsung S27A850D।

উপরোক্ত তিন প্রযুক্তির মধ্যে বেশি সস্তায় তৈরি করা যায় বলে টিএন প্রযুক্তি বেশি ব্যবহার হচ্ছে। আর এ প্রযুক্তিতে তৈরি ডিসপ্লে প্যানেলগুলোর দাম ৩০০ ডলারের নিচে। এ প্রযুক্তির অন্যতম সুবিধা হলো–এর রেসপন্স টাইম দুই মিলি/সে. হয়ে থাকে। টিএন প্রযুক্তির প্রধান অসুবিধা হলো : ০১. বেশি কৌণিক দূরত্ব (অ্যাঙ্গেল অব ভিউ) থেকে ডিসপ্লে দেখা যায় না। ফলে বড় স্ক্রিন হলেও এক্ষেত্রে খুব লাভ হয় না। ০২. তুলনামূলকভাবে ভিএ এবং আইপিএস প্রযুক্তিতে তৈরি ডিসপ্লের থেকে ব্রাইটনেস অনেক কম হয়। ০৩. ডিসপ্লেতে বিভিন্ন রং তৈরি ও রংয়ের প্রক্ষেপণ ১০০% সঠিক হয় না। ০৪. এ প্রযুক্তিতে প্রতি আরজিবিতে (রেড, গ্রিন, ব্লু) ছয়টি বিট, তিনটিতে ১৮ বিট রং প্রদর্শন করতে পারে। ফলে ২৪ বিট ট্রু কালারে ১৬.৭ মিলিয়ন রং তৈরি করতে পারে না। এ কারণে কমপিউটারে ব্যবহার হওয়া গ্রাফিক্স কার্ডটি যদিও আউটপুটে ২৪ বিট ট্রু কালার দেয়। যদি এ প্রযুক্তির প্যানেল ব্যবহার করেন তবে ডিসপ্লেতে ১৬.৭ মিলিয়ন রংয়ের ছোঁয়া পাবেন না। সুতরাং বেশি বিটের রং তৈরি করতে না পারাও টিএন প্রযুক্তির একটি বড় অসুবিধা। এক্ষেত্রে বলা দরকার, মনিটরের ডিসপ্লে বিট ধারণক্ষমতা যত বেশি হবে, ট্রু কালারের রং প্রদর্শন ক্ষমতা তত বাড়বে। যেমন–৮ বিটের চেয়ে ১৬ বিটের কিংবা ১৬ বিটের চেয়ে ২৪ বিটের ছবি আরো স্বচ্ছ, জীবন্ত ও সত্যিকার মনে হবে।

ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট প্রযুক্তিকে এস-পিভিএ (SPDA) বলা হয়। তুলনামূলকভাবে টিএন প্রযুক্তি থেকে ভিএ প্রযুক্তিতে তৈরি ডিসপ্লের ভিউয়িং অ্যাঙ্গেল (কৌণিক দূরত্ব থেকে দেখা) অনেক বেশি। এ প্রযুক্তিতে টিএন থেকেও অনেক বেশি ব্রাইটনেস পাওয়া যায়। ট্রু কালার তৈরির ক্ষেত্রেও ভিএ প্রযুক্তি টিএন থেকে বেশি রং তৈরি করতে পারে। তথাপি এর রেসপন্স সময় টিএন থেকে বেশি বলে টিএন প্যানেল থেকে একটু ধীরগতিতে আউটপুট দেয়। অন্যদিকে এ ধরনের প্যানেলের দামও টিএন থেকে বেশি।

আইপিএস প্রযুক্তি হলো এলসিডির সর্বশেষ প্রযুক্তি। অন্যান্য প্রযুক্তি থেকে এ প্রযুক্তিতে তৈরি ▶

প্যানেলের ভিউয়িং অ্যাঙ্গেল অনেক বেশি পাশাপাশি। এটি ভিএ এবং আইপিএস থেকেও আরো বেশি রং প্রদর্শন করতে পারে। ১৯৯৬ সালে হিটাচি প্রথম এ প্রযুক্তির উন্নয়ন শুরু করে। অনেক দামি বলে ছোট আকারে এ প্যানেলের চাহিদা কম। ২২ ইঞ্চি একটি ডিসপ্লে প্যানেলের দাম এখনও প্রায় ২২ হাজার টাকা পড়ে। বাহ্যিকভাবে আইপিএস এবং টিএন প্যানেলের পার্থক্য বোঝার একটা উপায় হলো–টিএন প্যানেলের স্ক্রিন আইপিএসের স্ক্রিনের তুলনায় কিছুটা নমনীয়। ফলে আঙুল দিয়ে হালকাভাবে টিএন প্যানেলে চাপ দিলে ভেতরের দিকে স্ক্রিন ঢুকতে থাকে। কিন্তু আইপিএস স্ক্রিনের ক্ষেত্রে এমন হয় না আইপিএস স্ক্রিন কিছুটা শক্ত বলে।

এবার দেখে নেয়া যাক এলসিডি মনিটরের কমন কিছু বিষয় :

অ্যাঙ্গেল অব ভিউ : ফ্ল্যাট মনিটরগুলোর ডিসপ্লে লেন্সের মাধ্যমে (উল্লম্ব/অবতল) এমনভাবে ছবি প্রদর্শন করে যে মনিটরের প্রায় সমান্তরাল থেকেও সঠিকভাবে ছবি উপভোগ করা যায়। মনিটরের স্ক্রিন ছোট বা বড় যাই হোক অ্যাঙ্গেল অব ভিউ যত বেশি হবে তত বেশি কৌণিক দূর থেকে ছবি উপভোগ করতে পারবেন। অ্যাঙ্গেল অব ভিউ সাধারণত ১৫০-১৯০ হরাইজন্টাল ভার্টিক্যাল হয়।

পিক্সেল : একটি ডিসপ্লের সবচেয়ে ক্ষুদ্র অংশ পিক্সেল। ডিসপ্লের একটি রংয়ের বিন্দুকে পিক্সেল বলে। প্রতিটি ডিসপ্লে প্যানেল ভাগ করা থাকে

একটি ম্যাট্রিক্স আকারে। বোঝার সুবিধার্থে একে জালের/তারের জালির সাথে তুলনা করা যায়। উপরের চিত্রে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

প্রতিটি ভাগে তিনটি করে রংয়ের আবরণ থাকে (লাল, সবুজ, নীল)। যখন লিকুইড ক্রিস্টালে কোনো সিগন্যাল আসে তখন সিগন্যাল অনুযায়ী এ তিন রংয়ের সমন্বয়ে একটি রং তৈরি হয়। এভাবেই একেকটি পিক্সেল তৈরি হয়। সাধারণত সিআরটি মনিটরের পিক্সেল সাইজ ০.২৫ থেকে ০.২৮ মি.মি. হয়। অন্যদিকে এলসিডি এবং এলইডির ক্ষেত্রে ০.৩১-০.২১ মি.মি. হয়। মনিটরের ডিসপ্লে প্যানেল যত বড় হয় আনুপাতিক হারে এর পিক্সেলও বড় হতে থাকে। যেকোনো ডিসপ্লের ক্ষেত্রে এর পিক্সেল সাইজ যত ছোট হবে তত এর ছবির কোয়ালিটি ভালো হবে।

কন্ট্রাস্ট রেশিও : এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ডিসপ্লের জন্য। এটি তুলনা করা হয় অন্ধকার ও আলোর মধ্যে। পাশের কলামে চিত্রে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। দেখা যাচ্ছে সূর্যটা অধিক আলোকপূর্ণ। সূর্যের আভা লম্বালম্বি যেখানে পড়েছে ধীরে ধীরে আলো কমে এসেছে। যত সূর্য দূরে দেখবেন তত আলো কমেছে। ডিসপ্লেতে এ কাজটি করছে কন্ট্রাস্ট রেশিও। কন্ট্রাস্ট রেশিও যত বেশি হবে তত ছবির আলো ও অন্ধকারের পার্থক্য বেশি বোঝা যাবে। বর্তমানে ৫০,০০০:১, ৮০,০০০:১ মানেরও কন্ট্রাস্ট রেশিও ছোট আকারের ডিসপ্লেতে এবং ১২০০০,০০০:১, ১৫০০০,০০০:১ বড় আকারের ডিসপ্লে পাওয়া যাচ্ছে।

ব্যাকলাইট প্রযুক্তি : এলসিডিতে লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লের পেছনে সাদা নিয়ন লাইট লাগানো থাকে। একে ব্যাকলাইট প্রযুক্তি বলে। আসলে আলো না থাকলে কি কোনো ছবি হবে। ব্যাকলাইট ব্যবহার করে ছবিতে অতিরিক্ত আলো সরবরাহ করা হয়। এটি ব্যবহারে যেকোনো ছবিতে আলো-অন্ধকারের বিষয়টি আরো বেশি ফুটে ওঠে। ফলে ছবি আরো জীবন্ত মনে হয়। কিছু ডিসপ্লেতে কোল্ড ক্যাথোড ফ্লুরোসেন্ট, আবার কিছু ডিসপ্লেতে ডব্লিউ লাইট ব্যাকলাইট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ডব্লিউ ব্যাকলাইট দুই ধরনের–০১. আরজিবি, ০২. ইএল। সাধারণত

এ লাইটগুলো ডিসপ্লের চারপাশে কিনারা বরাবর সংযুক্ত থাকে।

রিফ্রেশ রেট : প্রতি সেকেন্ডে একটি মনিটর সর্বোচ্চ কয়টি স্টিল ছবি তৈরি করতে পারে তা নির্ভর করে রিফ্রেশ রেটের ওপর। যেমন–টিভির ক্ষেত্রে তিন ধরনের সিস্টেম কাজ করে। এনটিএসসি (৫০ হার্টজ); পাল এবং সিক্যাম (৬০

হার্টজ) প্রতি সেকেন্ডে ২৪টি স্টিল ছবি/ফ্রেম তৈরি করে। অন্যদিকে সিরআরটি মনিটর ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৫-২০ ইঞ্চির মনিটরগুলো ৬০-৭২ হার্টজে কাজ করে। বর্তমান সময়ে এলইডি বা এলসিডিগুলো ১০০ থেকে ১২০ হার্টজে ফ্রেম তৈরি করে। অনেক এলসিডি বা এলইডি মনিটরে হার্টজ না লিখে রিফ্রেশ রেটকে ফ্রেম আকারে লেখা হয়। যেমন–৬০০ ফ্রেম/সে.। মূল কথা হলো হার্টজ যত বেশি হবে তত বেশি আপনি স্বচ্ছ জীবন্ত ছবি পাবেন। হার্টজের সাথে রেজ্যুলেশনের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আপনি কত হার্টজে কত রেজ্যুলেশনের ছবি উপভোগ করছেন তার ওপর নির্ভর করছে ছবির কোয়ালিটি। উপরের ছবি দুটি লক্ষ করুন।

৬০ হার্টজে একই ছবিতে ছবির যে সাবজেক্টগুলো দেখা যাচ্ছে না, ১২০ হার্টজে সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে অতিরিক্ত হিসেবে সে সাবজেক্টগুলো।

অ্যান্টি গ্লেয়ার টেকনোলজি : এখন পর্যন্ত এর সীমাবদ্ধতা এলইডি মনিটরে। মনিটরের উল্টোদিকে যদি কোনো আলো থাকে তবে মনিটরে সে আলোর ▸

গ্লেয়ার প্যানেল

অ্যান্টি গ্লেয়ার প্যানেল

প্রভাব পড়ে। ছবিতে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। আলোর উজ্জ্বলতা বেশি হলে মনিটরের স্ক্রিনের যে জায়গায় স্পষ্ট বোঝা যায় না। কিন্তু অ্যান্টি গ্লেয়ার থাকলে তা সেই প্রতিফলিত আলো প্রতিহত করে স্ক্রিনের ডিসপ্লেতে স্পষ্ট সব দেখাতে পারে।

রেসপন্স টাইম : ছবির ধরন অনুযায়ী ডিসপ্লের প্রতিটি ম্যাট্রিক্সে একটি কারেন্ট প্রয়োগ করা হয়। যার প্রভাবে ডিসপ্লেটি রং পরিবর্তন করে। একটি পিক্সেল কালো থেকে সাদা বা সাদা থেকে কালো হতে যে সময় নেয়, সেই সময়কেই রেসপন্স টাইম বলে। রেসপন্স টাইম হিসাব করা হয় মিলি সেকেন্ডে। কোনো মনিটরের রেসপন্স সময় যত কম হবে তত দ্রুত সে মনিটরের প্রতিটি পিক্সেল রং পরিবর্তন করতে পারবে। যারা মনিটরে দ্রুত চলমান গ্রাফিক্সের কাজ করেন অথবা যারা খুব ফার্স্ট রেসিং গেম খেলেন তাদের জন্য বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এক্ষেত্রে রেসপন্স সময় বেশি হলে মনিটরে ঘোস্টিং স্ক্রিন দেখতে পাবেন।

সম্প্রতি এলসিডিতে যুক্ত হয়েছে ডিসিআর (ডায়নামিক কন্ট্রাস্ট রেশিও)। একে এসিআর (অ্যাডভান্স কন্ট্রাস্ট রেডিও) বলে। যেমন–অন্ধকার রুমে আপনি একটি ভৌতিক ছবি দেখছেন কমপিউটারে। মাঝে মাঝে কিছু অন্ধকারপূর্ণ ছবি আসছে। এমন অবস্থায় কতখানি ভালোভাবে ছবিটি বোঝা যাবে। এখানেই কাজ করে ডিসিআর। ডিসিআরের কাজ হলো ছবির ধরন বুঝে স্ক্রিনের কন্ট্রাস্ট বাড়ানো এবং কমানো। আর আলো বাড়ানো এবং কমানোর মূল কাজটি করে ব্যাকলাইট। ব্যাকলাইটের সাথে এজন্য যুক্ত করা হয় এক ধরনের সেন্সর।

অ্যাকটিভ এবং প্যাসিভ থ্রিডি : বর্তমান সময়ে দুই ধরনের টেকনোলজি ব্যবহার করে থ্রিডি মনিটরগুলো তৈরি করা হচ্ছে।

অ্যাকটিভ থ্রিডি : এ টেকনোলজিতে ক্যামেরার মতো এক ধরনের সাটার ব্যবহার করা হয়।

প্যাসিভ থ্রিডি : এ টেকনোলজিতে কোনো সাটার ব্যবহার করা হয় না। যার জন্য অ্যাকটিভ থেকে প্যাসিভ থ্রিডি মনিটর দামে সাশ্রয়ী।

প্রতিটি প্রযুক্তির কম-বেশি সুবিধা-অসুবিধা রয়েছে। এলসিডির সাধারণ কিছু সমস্যার মধ্যে ডিসপ্লের আলো কমে যাওয়া একটি প্রধান সমস্যা। অনেক সময় ডিসপ্লের আলো ব্রাইটনেস হঠাৎ করেই কমে যায়। এ সমস্যার মূল কারণ ডিসপ্লের পেছনের ব্যাকলাইট। ব্যাকলাইট যদি হঠাৎ নষ্ট হয়ে যায় তবে ব্রাইটনেস হঠাৎ করেই কমে যাবে। একটি কথা বলতেই হয়–যে ফ্লুরোসেন্ট লাইট ব্যাকলাইট হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেগুলো সাধারণত চার থেকে সাত বছর পর্যন্ত ভালোই আলো দেয়। তারপর ধীরে ধীরে আলো কমতে থাকে।

ডিসপ্লের হরাইজন্টাল বা আড়াআড়ি বরাবর কালো লম্বালম্বি রেখা পড়ে। এটিও এলসিডিতে বেশি দেখা যায়। সাধারণত ভোল্টেজ বেশি ওঠানামা করলে এলসিডির পাওয়ার সাপ্লাই দুর্বল হতে থাকে। ফলে পাওয়ার সাপ্লাইয়ে যে ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর থাকে তা নষ্ট অথবা দুর্বল হয়ে যায়। এ ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরগুলো অমসৃণ বিদ্যুৎকে মসৃণ করে লিকুইড ক্রিস্টালে সাপ্লাই দেয়। ফলে অমসৃণ বিদ্যুৎ ডিসপ্লের ক্রিস্টালে আসে বলে এ সমস্যা তৈরি হয়। এ সমস্যা থেকে মুক্ত থাকতে ভালো মানের ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার ব্যবহার করা দরকার।

ডেড পিক্সেল : বোঝাই যাচ্ছে যে পিক্সেলটি মৃত। এটি হয় কালো অথবা সাদা বিন্দু আকারে সবসময় প্রদর্শিত হবে ডিসপ্লেতে। সাধারণত প্রথম অবস্থায় অনেক ব্যবহারকারী সমস্যাটি বুঝতে পারেন না। ধীরে ধীরে যখন ডেড পিক্সেল বাড়তে থাকে তখন সমস্যাটি বুঝতে পারেন। এ সমস্যাটি এলসিডির জন্য বেশ মারাত্মক। সাধারণত ফ্যাক্টরি ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের সময় কোনো সমস্যা ক্রিস্টালে হয়ে গেলে এ সমস্যা তৈরি হয়। যদি ডেড পিক্সেলের পরিমাণ বেড়ে যায়, তবে পুরো প্যানেলটিই পরিবর্তন করা ছাড়া আর উপায় থাকে না।

ঘোস্টিং সমস্যা : এ সমস্যা মূলত তৈরি হয় রেসপন্স টাইমের জন্য। এটিই ঘোস্টিং সমস্যা। তাই একে হুবহু সমস্যার সাথে তুলনা করা হয়েছে। যত বেশি এই রেসিং ভিডিওর মতো ভিডিও দেখবেন অথবা ফার্স্ট রেসিং গেম খেলবেন তত বেশি এ সমস্যা বুঝতে পারবেন। অনেক সময় এমন হয় স্ক্রিনে অনেক সাবজেক্ট দেখাও যায় না। আসলে মনিটরের ইনপুটে যে ছবি আসছে রেসপন্স সময় বেশি হওয়ায় সে ছবি পিক্সেল আবারো স্ক্রিনে ফুটিয়ে তোলার আগেই আরেকটি ছবি ডিসপ্লেতে চলে আসছে। ফলে এ সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ইন্টার ফেয়ারেন্স বা ইএমআই : এটি এক ধরনের তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ, যা সব সময়ই মনিটরের রঙয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যদিও মনিটর গবেষকরা ধীরে ধীরে এই ইএমআইয়ের প্রভাব থেকে অনেকখানি বের হয়ে এসেছেন। তথাপি দাম কমানোর জন্য এখনও অনেক কোম্পানি মনিটরের ডিসপ্লেতে ভালোভাবে সিল্ডেড করেন না। ফলে ইএমআইয়ের সমস্যা থেকেই যায়। বিশেষ করে যদি স্ক্রিনের কাছেই কোনো স্পিকার থাকে তবে সে স্পিকারের চুম্বকের প্রভাবে ডিসপ্লের রঙয়ের প্রক্ষেপণ আস্তে আস্তে নষ্ট হতে থাকে। এ জন্য যথাসম্ভব মনিটরের স্ক্রিন থেকে স্পিকার দূরে রাখা ভালো। পাশাপাশি স্পিকার কেনার সময় তা কতখানি সিল্ডেড করে তা যাচাই করা উচিত।

নতুন মনিটর কেনার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া উচিত।

০১. প্যানেল টাইপ : মনিটরের প্যানেলটি কোন ধরনের হবে–টিএন/ ভিএ/ আইপিএস/ এলইডি। ০২. রেসপন্স টাইম : মনিটরটির রেসপন্স টাইম কত–৮/৫/৩/২/১। ০৩. পিক্সেল সাইজ : ডিসপ্লের পিক্সেল সাইজ কত–০.২৮/০.২৭/০.২২/০.২১। ০৪. ব্রাইটনেস : মনিটরটির ব্রাইটনেস কত–৩০০/২৫০/৩৫০/২২৫ CD/m². ০৫. ভিউয়িং অ্যাঙ্গেল : ১৭৮/১৬০/১৯০/১৭০। ০৬. কন্ট্রাস্ট রেশিও : ১০০০:১/ ২০০০:১/ ৩০০০:১ না আরো বেশি। ০৭. ডায়নামিক কন্ট্রাস্ট রেশিও আছে কি না। যত বেশি হবে তত ভালো। ০৮. ব্যাক লাইট সুবিধা আছে কি না। ০৯. সর্বোচ্চ কত ফ্রিকোয়েন্সিতে কত রেজ্যুলেশন পাওয়া যাবে। ১০. মনিটরের স্ক্রিন সাইজ কত? ১১. মনিটরের রিফ্রেশ রেট কত? ১২. কত ওয়াট বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় মনিটরটি চলতে। ১৩. মনিটরটির আউটপুট হিসেবে কি কি কানেক্টর আছে। ১৪. সর্বোপরি ওয়ারেন্টি সময়সীমা কত?

## অতিরিক্ত যে সুবিধাগুলো দেখা প্রয়োজন

০১. ওয়াল মাউন্টের সুযোগ রয়েছে কি না। ০২. টিভি মনিটর না হলে এ সুবিধা বেশি কাজে লাগে। ০৩. স্পিকারের অপশন আছে কি না। ০৪. মনিটরটির ওজন কত। ০৫. মার্কারি ফ্রি কি না।

ফিডব্যাক : tahid@gmail.com